দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৪১ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৪
ISSN: 1607-0380 (Print), DOI: https://doi.org/10.63809/DOP/V04112/KT24006

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদঃ সমন্বয়ের সমস্যা
(Anthropocentrism and Non-Anthropocentrism: Problem of Reconciliation)

খন্দকার তোফায়েল আহমেদ*

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকে দর্শনের স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে পরিবেশ দর্শনের সূচনা হয় যা প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের নৈতিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করে। পরিবেশ দর্শনের সূচনা থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রকৃতির নৈতিক মূল্য নিয়ে একটি বিতর্ক রয়েছে। এক্ষেত্রে চিরাচরিতভাবে দার্শনিক ও পরিবেশবাদীরা দুটি ধারায় বিভক্ত: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে কেবল মানুষই নৈতিকভাবে বিবেচ্য একমাত্র প্রাণীজগতের সদস্য, যেখানে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে নৈতিকতা প্রকৃতির সকল উপাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আবার একই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যেও ভিন্ন অবস্থান লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা উক্ত মতবাদের বিরোধিতা করেন। যেমন মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমর্থক হয়েও অনেকে অ-মানব সত্তার নৈতিক গুরুত্বকে স্বীকার করেন। অবশ্য তাঁরা প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের স্বার্থের চেয়ে মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, যদিও অ-মানব সত্তার নৈতিক মূল্য রয়েছে তথাপি মানুষের স্বার্থে অ-মানব সত্তাকে ব্যবহার করা ন্যায়সঙ্গত যেটি অনেক পরিবেশ দার্শনিকদের মতে জৈবিক ঘটনা। অন্যদিকে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমর্থক হয়েও অনেকে মনে করেন যে, নৈতিকতার প্রশ্ন শুধুমাত্র তাদের উপরই প্রযোজ্য যারা আনন্দবোধ ও দুঃখবোধ অনুভব করতে পারে। আবার অনেকে মনে করেন নৈতিকতার প্রশ্ন সকল প্রাণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বস্তুত তুলনামূলকভাবে যারা উদারপন্থী তাঁরা মনে করেন নৈতিকতার প্রশ্ন পরিবেশের সকল উপাদানের উপর প্রযোজ্য। এভাবে দেখা যায় মতবাদ দুটির প্রবক্তাগণ মৌলিকভাবে পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান করছেন। বর্তমান

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: kh.tofayel@gmail.com

প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো নৈতিক ন্যায্যতার আলোকে মতবাদ দুটোর মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় সেই যুক্তি উপস্থাপন করা যা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে অপরিমেয় ভূমিকা পালন করবে।]

[**Abstract:** Environmental philosophy emerged as a distinct branch of philosophy in the twentieth century, primarily concerned with the moral value of entities within nature and the complex relationship between human beings and the natural environment. Since its inception, one of the most enduring debates within this field has revolved around differing perspectives on the moral worth of nature. Philosophers and environmentalists have traditionally been divided into two broad schools of thought: anthropocentrism and non-anthropocentrism. The anthropocentric perspective maintains that moral consideration exclusively applies to human beings, whereas the non-anthropocentric viewpoint extends moral significance to all entities in nature. However, within each of these perspectives, there exist various nuanced positions that further complicate the discourse. It is crucial to recognize that disagreement within these schools does not necessarily equate to direct opposition. For instance, some anthropocentric thinkers acknowledge the moral significance of non-human entities but still uphold the idea that human needs should take precedence. They argue that while non-human beings possess some level of moral value, their use for human benefit remains justified. Conversely, within non-anthropocentrism, a range of views can be found—some scholars argue that moral status should be assigned only to sentient beings capable of experiencing suffering, while others advocate for an even broader ethical framework that grants moral consideration to all aspects of nature, including ecosystems and inanimate entities. Given these differences, the fundamental nature of these two perspectives appears to be in direct contradiction. However, this paper aims to explore whether any reconciliation between anthropocentrism and non-anthropocentrism is possible, examining theoretical and philosophical approaches that might bridge the gap between these seemingly opposing ethical paradigms. By engaging with the complexities and intersections of these perspectives, this study aspires to contribute to the broader discourse on environmental ethics and the moral considerations that underpin our relationship with the natural world.]

ভূমিকা

পরিবেশ অসংখ্য উপাদান নিয়ে গঠিত। পরিবেশের অন্তর্গত প্রতিটি উপাদানে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও গুরুত্ব। যদিও অনেকে বিশেষ কিছু উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাঁদের মতে প্রকৃতির সকল উপাদান সমান নৈতিক মূল্যের অধিকারী নয়। এভাবে দেখা যায় পরিবেশের উপাদানের উপর নৈতিক মূল্য আরোপের প্রশ্নে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাঁদের মতপার্থক্য প্রধানত দুটি বিপরীত ধারায় বিভক্ত: মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ। প্রথমটি দাবি করে, প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কেবল মানুষেরই নৈতিক মূল্য রয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্য সকল উপাদানের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে যা নির্ভর করে তাদের উপযোগিতার উপর। অর্থাৎ মানুষের সাথে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের সম্পর্ক তৈরি হয় তাদের উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে। অপরদিকে দ্বিতীয়টি দাবি করে, পরিবেশের সকল উপাদানেরই নৈতিক মূল্য রয়েছে। তাদের নৈতিক মূল্য উপযোগিতার উপর নির্ভর করে না বরং নৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা হিসেবে তাদের উপযোগিতা রয়েছে। নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ার জন্য উপযোগিতা কখনো মানদণ্ড হতে পারে না। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় দার্শনিকরা পরিবেশের উপাদানের উপর নৈতিক মূল্য আরোপের প্রশ্নে বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাই মতবাদ দুটোর মধ্যে সমন্বয় নির্ণয়ের পূর্বে উভয়ের সাধারণ প্রকৃতি এবং এদের পক্ষে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

'মানবকেন্দ্রিক' প্রত্যয়টির একাধিক অর্থ রয়েছে। বাস্তবে প্রত্যয়টিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। ফলে মানুষের মনে প্রত্যয়টির অর্থ নিয়ে এক ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। পরিবেশ দর্শনে 'মানবকেন্দ্রিক' প্রত্যয়টিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Anthropocentrism যা গ্রিক শব্দ Anthropos ও Kentron থেকে উদ্ভূত। Anthropos শব্দের অর্থ হলো মানুষ এবং Kentron শব্দের অর্থ হলো কেন্দ্রিক। অতএব বুৎপত্তিগত অর্থে মানবকেন্দ্রিক প্রত্যয়টির অর্থ হলো মানুষ-কেন্দ্রিক। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বস্তুত মানুষ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে। যে মতবাদ মনে করে বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, মানুষ জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করে, মানুষ সৃষ্টির সম্রাট, এবং জগতের অন্যান্য সবকিছু মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে অস্তিত্বশীল, সে মতবাদের নাম মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (উদ্দিন, ২০০৭, ৮১)।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মূল বক্তব্য হলো, নৈতিক মানদণ্ডগুলো কেবলমাত্র মানুষের উপর প্রযোজ্য। মানুষের প্রয়োজন ও স্বার্থেরই কেবল

উচ্চতম গুরুত্ব ও নৈতিক মূল্য রয়েছে (Botzler and Armstrong, 2003,2)। প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে এমনকি তাদের ব্যবহারিক মূল্যও নির্ধারিত হয় বাস্তব উপযোগিতার ভিত্তিতে। যেমন একটি হরিণের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে, স্বতঃমূল্য নেই। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ হরিণকে ব্যবহার করে বলেই এর ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তাছাড়া হরিণের উপর নৈতিক মূল্য প্রযোজ্য না হওয়ার আরো একটি কারণ হলো হরিণ নিজের কর্মের ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করতে সমর্থ নয়। কিন্তু মানুষ নিজের কর্মের ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করতে সমর্থ। অতএব মানুষ অন্য সকল প্রাণীকে ব্যবহার করতে পারে যেহেতু মানুষ তাদের কাছে উচ্চতর। উচ্চতর প্রাণী হিসেবে মানুষকে বিবেচনা করার পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য দার্শনিক এরিস্টটল, ডেকার্ত, কান্ট এবং জন পাসমূরের চিন্তায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উল্লেখ রয়েছে। যদিও সেই সময় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রত্যয়ের সূচনা হয়নি। কিন্তু মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সারকথা তাদের দর্শনে বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া ইহুদি-খ্রিস্ট ধর্মেও এই মতবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। এরিস্টটল ও কান্ট বুদ্ধিবৃত্তিকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে বিবেচিত। এরিস্টটল তাঁর *পলিটিক্স* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ভিদ অস্তিত্বশীল প্রাণীর স্বার্থে, এবং কিছু প্রাণী অস্তিত্বশীল অন্য প্রাণীর স্বার্থে। গৃহপালিত প্রাণীরা মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়, বন্য প্রাণীরাও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আমাদেরকে উদিত করার জন্য যদিও সকল ক্ষেত্রে নয়, তবে কেবল খাদ্য দিয়ে নয় বরং বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা দিয়ে, যেমন পোশাকের সরবরাহ এবং জীবনে একই ধরনের আরো অনেক সহযোগিতা (Madhabendra, 2003, 408)। অর্থাৎ যাদের বুদ্ধিবৃত্তি নেই তারা অস্তিত্বশীল হয় কেবল সেই সকল সত্তার স্বার্থে যাদের উচ্চতর সামর্থ্য রয়েছে। আর সকল প্রাণের মধ্যে কেবল মানুষেরই উচ্চতর সামর্থ্য রয়েছে। এরিস্টটলের মতে, মৌমাছি কিংবা অন্যান্য দলবদ্ধ প্রাণীর চেয়ে মানুষের উচ্চতর মর্যাদা রয়েছে। সকল প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষেরই ভাষা শক্তি রয়েছে (Michael, 1993, 76)। যদিও অন্যান্য প্রাণীরা শব্দ তৈরি করতে পারে যার দ্বারা সুখ-দুঃখ প্রকাশ করা সম্ভব কিন্তু ন্যায়-অন্যায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বস্তুত ন্যায়-অন্যায় প্রকাশের জন্য ভাষা আবশ্যক।

এরিস্টটল তাঁর দর্শনে বৌদ্ধিক আত্মার কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষই কেবল এই বৌদ্ধিক আত্মার অধিকারী। তাঁর মতে অন্য সকল প্রজাতিরও আত্মা রয়েছে। তবে সেসব আত্মার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন উদ্ভিদের রয়েছে জায়মান বা বর্ধমান আত্মা। উদ্ভিদ-আত্মার কেবল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সামর্থ্য রয়েছে যা বাস্তবিকপক্ষে সকল প্রাণেরই একটি বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই বর্ধমান আত্মা হলো উদ্ভিদের একমাত্র সম্ভাবনা

(Michael, 1993, 168)। প্রাণীদের রয়েছে সংবেদনশীল আত্মা। কিন্তু এই সকল আত্মা থেকে বৌদ্ধিক আত্মা উচ্চতর। এরিস্টটলের মতে, মানুষই একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং মানুষের রয়েছে বৌদ্ধিক আত্মা (Michael, 1993, 170)। এরিস্টটল অ-মানব প্রজাতির উপর মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি সবকিছু সৃষ্টি করেছে বিশেষভাবে মানুষের জন্য। মানুষের নিমিত্তস্বরূপ ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল (Lawrence, 1991,174)। মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে এরিস্টটলের এই ব্যাখ্যার সাথে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা মানবকেন্দ্রিকতাবাদও মনে করে অন্য সকল প্রজাতি কেবল মানুষের প্রয়োজনেই অস্তিত্বশীল।

অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক জন পাসমূর মনে করেন মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির অন্য সকল উপাদানের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। তাই তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা অন্যায় নয়। কিন্তু মানুষ হত্যা করা নৈতিকভাবে অন্যায়। কারণ মানুষ নৈতিক মর্যাদার আধকারী। নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হিসেবে মানুষের উচিত প্রকৃতির অন্য উপাদানকে নির্বিচারে ব্যবহার না করা। তিনি তাঁর *Man's Responsibility for Nature* গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতিকে নির্বিচারে ব্যবহারের যে মনোভাব মানুষের রয়েছে তা তাদের নিজেদের স্বার্থেই পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি সহনশীল মনোভাব কখনোই প্রকৃতির স্বতঃমূল্যকে নির্দেশ করে না। তাঁর মতে, ব্যাকটেরিয়া এবং মানুষ পারস্পরিক কর্তব্যবোধকে স্বীকার করে না, তাদের সাধারণ স্বার্থও নেই। যে অর্থে একটি সম্প্রদায়ে যুক্ত হওয়া নৈতিক কর্তব্যবোধের সৃষ্টি করে, তারা একই সম্প্রদায়ে যুক্ত নয়। অতএব যদি বলা হয় প্রাণী, উদ্ভিদ, ভূদৃশ্যের জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে তাহলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে (Passmore, 1980, 204)। অর্থাৎ পাসমূর মনে করেন পরিবেশের প্রতি মানুষের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মানুষের উচিত পরিবেশকে নির্বিচারে ব্যবহার না করে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা।

দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ত বাইবেল ও এরিস্টটলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। ডেকার্তের মতে ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উচ্চতর জীব হিসেবে। যদিও মানুষের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীরা দেহের অধিকারী যার কাজ উভয় ক্ষেত্রে প্রায় একই রকম। তারপরও উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। মানুষ উচ্চতর জীব এই অর্থে যে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি রয়েছে যা অন্যান্য প্রাণীদের নেই। তাঁর মতে, মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরা বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী নয় যেহেতু তাদের ভাষাশক্তি নেই (Michael, 1993, 182)। বস্তুত বৌদ্ধিক আত্মা থেকে বুদ্ধিবৃত্তি নিঃসৃত হয়। আর বৌদ্ধিক আত্মা কেবল মানুষেরই রয়েছে। বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্য ডেকার্ত

মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। যদি এমন যন্ত্র তৈরি করা যায়, যার প্রাণীর ন্যায় বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে তাহলে যন্ত্র এবং প্রাণী অভিন্ন হবে। কিন্তু যন্ত্রটির যদি মানুষের ন্যায় অঙ্গ থাকে তবুও এটি মানুষের সাথে অভিন্ন হবে না এই কারণে যে, যন্ত্র মানুষের মতো শব্দ তৈরি করতে পারে না। এমনকি দৈহিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দ তৈরি করতে পারলেও তা যন্ত্রের অঙ্গের পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া শব্দ তৈরি করতে পারলেও যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় তখন তার পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। মানুষ যেমন শব্দ তৈরি করতে পারে তেমনি তাকে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রশ্ন করা হলে সে উত্তর দিতে পারে। যন্ত্রের সাথে মানুষের আরো একটি পার্থক্য হলো যন্ত্র নিজে ক্রিয়া করতে পারে না। কিন্তু মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে নিজে ক্রিয়া করতে পারে। যন্ত্র পরিচালিত হয় মাধ্যম দ্বারা আর মানুষ পরিচালিত হয় বুদ্ধি দ্বারা। এখানে যন্ত্রের সাথে প্রাণীর মিল লক্ষ করা যায়। কিন্তু মানুষের সাথে যন্ত্রের যে পার্থক্য রয়েছে সেই একই পার্থক্য প্রাণীর সাথেও রয়েছে। ডেকার্ত মনে করেন যন্ত্রের যেমন ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য নেই তেমনি প্রাণীরও ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য নেই। আবার যন্ত্রের বিচারশক্তিও নেই যা মানুষের রয়েছে। এখানে যন্ত্রের সাথে প্রাণীর সাদৃশ্য হলো উভয়েরই ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য ও বিচারশক্তি নেই। কিন্তু এই উভয় গুণই মানুষের রয়েছে। তাই যন্ত্র ও প্রাণীর চেয়ে মানুষের বিশেষ মূল্য রয়েছে। মানুষ পরিবর্তিত পরিবেশে এগুলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব এটি দাবি করা যায়, একমাত্র মানুষই নৈতিকভাবে বিবেচ্য।

ডেকার্তের সমালোচনা করে এক্ষেত্রে যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, ভাষা ব্যবহারের কারণে যদি মানুষ বিশেষ মূল্যের অধিকারী হয় তাহলে সেসব প্রাণীও বিশেষ মূল্যের অধিকারী হবে যারা ভাষা ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে অনেক প্রাণীকে ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়। যদিও বাস্তবতা হলো প্রাণীরা পরিবর্তিত পরিবেশে ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। তারা মূলত কিছু নির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহারে সক্ষম যা তাদেরকে দীর্ঘদিনে শেখানো হয়। পরিবর্তিত পরিবেশে ভাষা ব্যবহারের জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন তা প্রাণীদের নেই। তাই প্রাণীরা কিছু নির্দিষ্ট চিহ্ন ও ভাষা ব্যবহারে সক্ষম বলে এটি দাবি করা যায় না যে, প্রাণীদের ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্য রয়েছে। আবার মানবাত্মার প্রকৃতিও প্রমাণ করে যে, মানুষের সাথে অন্য সকল প্রাণীর পার্থক্য রয়েছে। কারণ মানবাত্মা হলো বৌদ্ধিক আত্মা। বৌদ্ধিক আত্মা দেহের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। যদিও দেহের বিনাশের পর এটি বিনষ্ট হয় না। প্রাণীদের মনও নেই এই অর্থে যে, প্রাণীদের বুদ্ধি নেই যা মনে অবস্থান করে। ডেকার্তের মতে, প্রাণীরা রোবটের ন্যায় বুদ্ধি দিতে পারে না এমনকি কষ্ট অনুভব করতে পারে না (Lawrence, 1991, 192)। অতএব প্রাণীদেরকে জড় পদার্থের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। সর্বোপুরি ডেকার্ত মনে করেন বুদ্ধি হলো মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ বিশ্বজগতের সবকিছু অর্জন করতে পারে।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের চিন্তায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ লক্ষ করা যায়। তাঁর মতে, মানুষকে উপায় হিসেবে বিবেচনা করার পক্ষে কোন নৈতিক ন্যায্যতা নেই। মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। তিনি তাঁর নীতিদর্শনের উপর রচিত *Fundamental Principles of the The Metaphysics of Morals* গ্রন্থে বলেন, এমন উপায়ে কাজ করো যে, তুমি সর্বদা মানবতাকে বিবেচনা করো, হউক নিজের ক্ষেত্রে অথবা অন্য কারো ক্ষেত্রে, কখনো উপায় হিসেবে নয় বরং উদ্দেশ্য হিসেবে (Kant, 1785,56)। মানবমর্যাদা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কান্ট মানুষের সাথে জগতে বিরাজমান অন্য সবকিছুর পার্থক্য রচনা করেছেন। মানুষ ব্যতীত অন্য সবকিছুর কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে যা আপেক্ষিক ও শর্তাধীন। মানুষ তার প্রয়োজনে জগতে বিরাজমান অন্য সবকিছুকে ব্যবহার করে। তাদের মূল্য আপেক্ষিক বলার অর্থ হলো একই বিষয় বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন মূল্যে বিবেচিত হতে পারে। যেমন একজন কৃষক ও একজন মাংস বিক্রেতার কাছে একটি গরুর মূল্য ভিন্নরূপে বিবেচিত হয়। অন্যান্য বিষয় বলতে কান্ট মানুষ ব্যতীত অন্য সকল প্রাণী এবং জড় বস্তুকে নির্দেশ করেছেন। মানুষকে তিনি স্বতঃমূল্যের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। স্বতঃমূল্যের অধিকারী এই মানুষই হলো নৈতিক কর্তা। অতএব নৈতিক মানদণ্ড কেবলমাত্র নৈতিক কর্তার উপরই প্রযোজ্য, অন্য কিছুর উপর নয়।

পবিত্র গ্রন্থ ‘বাইবেল’ -এ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ইঙ্গিত রয়েছে। বাইবেল গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, ঈশ্বর নিজ হাতে স্বর্গ, পৃথিবী, জীব, জড় এবং অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, ঈশ্বর সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। শুরুতে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল এবং এর কোন আকার ছিল না। তারপর ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করে দিন-রাত আলাদা করেছেন। ঈশ্বর দুই ধরনের আলো সৃষ্টি করেছেন। যথা উজ্জ্বল আলো এবং ক্ষুদ্রতর আলো। প্রথমটি দিনে আলো দেয় এবং দ্বিতীয়টি রাতে। তিনি যে স্বর্গ সৃষ্টি করেছেন তার উপর এবং নিচে পানি প্রবাহমান। ঈশ্বর জগতের অন্য সকল উপাদান সৃষ্টি করেছেন মানুষ সৃষ্টির পূর্বে। পরিশেষে তিনি তার নিজ অবয়বে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে তিনি অন্য সবকিছু ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। অর্থাৎ সবকিছুর উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান (Zondervan, 1984, 1-2)।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রকারভেদ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রতিটি দৃষ্টিকোণকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রকার হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারে। যেমন:

১. পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ
২. সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এবং

৩. দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

পরিপ্রেক্ষিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

মানুষের প্রচলিত মনোভাব পরিপ্রেক্ষিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ মানুষ সাধারণত মনে করে যে জগতের সবকিছু তার প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সে তার ইচ্ছানুসারে সবকিছু ব্যবহার করবে। শুধু তাই নয়, মানুষ মনে করে তাকে কেন্দ্র করে জগতকে সাজানো হয়েছে। পরিপ্রেক্ষিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদের অন্যতম সমর্থক হলেন ফ্রেডরিক ফেরে। তাঁর মতে, জগৎ সম্পর্কে মানুষের ধারণা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তাদের অবস্থান দ্বারা এবং জগতে তাদের অস্তিত্বশীল হওয়ার পথ দ্বারা (Ferre, 1994, 72)। মানুষ হিসেবে চিন্তা করা ব্যতীত বিকল্প কিছু মানুষের নেই। নিজের অবস্থান নিয়ে মানুষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন কৌতূহল। চিন্তাশীল জীব হিসেবে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে বিভিন্ন রূপে। তবে সে কখনোই সেইসব অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে না যেগুলো দ্বারা সে শর্তাবদ্ধ। সে চিন্তা করে চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে থেকেই। স্বাদ নির্ণয়ের জন্য যেমন জিহ্বা অপরিহার্য তেমনি চিন্তা করার জন্য চিন্তা-কাঠামো অপরিহার্য। এ থেকে মানুষের পরিত্রাণ নেই (Ferre, 1994, 72)। চিন্তা-কাঠামোর নির্দেশনা অনুসারেই মানুষ চিন্তা করে। বস্তুত এমন অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে নির্দেশ করে। এখানে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি পরিবর্তিত হয় তার আপেক্ষিক পরিপ্রেক্ষণ দ্বারা। পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দাবি করে, জগতে মানুষের নৈতিক গুরুত্ব ও অবস্থান উপলব্ধি করার জন্য মানবকেন্দ্রিক চিন্তা অপরিহার্য। অনেক দার্শনিকের মতে নিজস্ব চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে থেকে চিন্তা করার অর্থ এই নয় যে, মানুষ শুধু নিজেকে নিয়ে চিন্তা করে। বরং অন্যকে নিয়ে চিন্তা করার অন্যতম শর্ত হলো নিজেকে নিয়ে চিন্তা করা। মানুষ অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি নিজের চিন্তার আলোকে বিচার করে।

পরিপ্রেক্ষিত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অনুসারে জগতের সবকিছুকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হয়। জগত সম্পর্কে অন্য প্রাণের চিন্তা কেমন হতে পারে তাও মানুষ তার অবস্থান থেকে কল্পনা করে। যেমন জগত সম্পর্কে একটি বিড়াল কী চিন্তা করতে পারে তাও মানুষ কল্পনা করে। এখানে হারগ্রভের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, মানুষ হিসেবে আমরা যখনই যা-কিছুকে মূল্য দেই সকল ক্ষেত্রেই মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই তা দিয়ে থাকি। এমনকি আমরা যখন একটি বাদুড়, একটি গাছ বা একটি পাহাড়ের জগত দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তা কল্পনা করি তখনও মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেই জগতের দিকে তাকাই। (বাদুড়ের, গাছের বা পাহাড়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাকাই না।) এই দেখা হলো অ-মানব সত্তার জগত দেখা সম্পর্কে মানুষের কল্পনা (Hargrove, 1992, 201)।

হারগ্রভের দৃষ্টিভঙ্গি ইঙ্গিত করে যে, মানুষের অবস্থান সবকিছুর উর্ধ্বে। জগত সম্পর্কে মানুষের চিন্তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। জগত সম্পর্কে অন্য প্রাণীর নিজস্ব চিন্তা থাকলেও মানুষ সেটিকে বিবেচনায় না নিয়ে অন্য প্রাণী সম্পর্কে নিজে কল্পনা করে। অর্থাৎ সবকিছুকে মানুষ নিজের চিন্তায় বিবেচনা করে। মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতায় এই দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থনযোগ্য।যদিও অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন এই কারণে যে, এটি মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও প্রজাতিবাদ উভয়ের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, একমাত্র মানুষই নৈতিকভাবে বিবেচ্য এবং মানুষের স্বার্থেরই কেবল নৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। আবার প্রজাতিবাদও মনে করে, মানুষ সবকিছুর উর্ধ্বে এবং মানুষেরই একমাত্র স্বতঃমূল্য রয়েছে। অন্য সকল প্রাণের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতগত মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, মানুষ তার চিন্তা-কাঠামোর মধ্যে থেকেই চিন্তা করে। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ অন্য প্রাণীর স্বার্থকে নির্বিচারে অগ্রাহ্য করে।

সবল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

সবল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, কেবল মানুষই নৈতিকভাবে বিবেচ্য। মানুষ ব্যতীত পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের কোন নৈতিক মূল্য নেই। মানুষ তার প্রয়োজনে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে বলে তাদের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। মানবকেন্দ্রিকতাবাদী এই চিন্তার সাথে প্রজাতিবাদের মিল রয়েছে। প্রজাতিবাদ মনে করে অন্যান্য প্রাণের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন এবং তাদেরকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। উভয় মতের সমর্থকরা মনে করেন, মানুষকে নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচনা করার পক্ষে কিছু কারণ রয়েছে। যেমন মানুষ স্বতঃমূল্যের অধিকারী। মানুষের সুখ-দুঃখ ভোগের সামর্থ্য রয়েছে। এমনকি একমাত্র মানুষের ঐচ্ছিক আচরণই নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে বিবেচনা করলে দেখা যায় মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীরা নৈতিক মূল্যের অধিকারী নয়। কেননা তারা মানুষের ন্যায় অনুভূতিশীল নয়। তারা সুখ-দুঃখ ভোগ করতে পারে না। মানুষের মতো তারা নিজেদের ক্রিয়া-কর্মকে নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে মূল্যায়ন করতেও সমর্থ নয়।যদিও অনেকে বিভিন্ন যুক্তিতে অন্যান্য প্রাণীর নৈতিক মূল্যের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। এসব যুক্তিতে তারা মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাণীর যেসব সাদৃশ্য রয়েছে সেগুলো উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সবল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, দুটি প্রজাতির মধ্যে কিছু সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হতে পারে না যে, উভয়ই নৈতিক মূল্যের অধিকারী।

দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

দুর্বল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে মানুষের উচিত প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকেও নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচনা করা। প্রকৃতির কোন উপাদানকে নির্বিচারে ব্যবহার করার নৈতিক ন্যায্যতা নেই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানুষ তার প্রয়োজনে প্রাণীদেরকে নির্বিচারে ব্যবহার করে। নির্বিচারে ব্যবহারের ফলে অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিদিন অসংখ্য প্রজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে এটিও দেখা যায়, মানুষের জন্য যেসব ঔষধ কিংবা প্রসাধনী তৈরি করা হয় সেগুলো মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য হবে কিনা তা নিরূপণের জন্য সেগুলো প্রথমে প্রাণীদের উপর ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে প্রাণীদেরকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হয় যার নৈতিক ন্যায্যতা নেই। মানুষের কল্যাণ হবে এমন অজুহাতে প্রাণীদেরকে ব্যবহার করা নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। তাছাড়া যে যুক্তিতে দাবি করা হয় মানুষের স্বতঃমূল্য রয়েছে সেই একই যুক্তিতে অন্যান্য প্রাণেরও স্বতঃমূল্য রয়েছে। যেমন বলা হয়, মানুষ বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উপায় হিসেবে হাঁস-মুরগী ভক্ষণ করে বলে মানুষের স্বতঃমূল্য রয়েছে। একইভাবে দাবি করা যায়, হাঁস-মুরগী বেঁচে থাকার জন্য উপায় হিসেবে পোঁকা-মাকড় ভক্ষণ করে বলে হাঁস-মুরগীরও স্বতঃমূল্য রয়েছে।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ তার প্রয়োজনে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করতে পারবে না। বরং মানুষের উচিত প্রাণীদেরকে নির্বিচারে ব্যবহার না করে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা। এমনকি মানুষ ও প্রাণীর স্বার্থের মধ্যে মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া। অনেকে অবশ্য যুক্তি দেন যে, মানুষকে যদি প্রয়োজন অনুসারে প্রাণীদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে প্রাণীদের বহু প্রজাতিই বিলুপ্ত হতে পারে। এমন দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে অনেকে যুক্তি দেন, বাস্তুতন্ত্রে প্রাণের অনুপাত এমনভাবে রয়েছে যে, যদি একে অপরকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে তাহলে কোন প্রজাতিই বিলীন হবে না। কারণ তাদের জন্মও হয় সুবিন্যস্ত অনুপাতে। দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের জন্য হলেও অন্যান্য প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। কেননা তাদের অস্তিত্বের বিলুপ্তি আমাদের অস্তিত্বকেও সংকটাপন্ন করতে পারে। তাই নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য হলেও তাদেরকে আমরা নির্বিচারে হত্যা করতে পারি না। তাছারা প্রাণীদের প্রতি নির্দয় আচরণের অভ্যাস যেকোনো সময় নিজ প্রজাতির প্রতিও হতে পারে। তাই পরিবেশের উপাদান হিসেবে তাদেরকেও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা উচিত।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পক্ষে যুক্তি

মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা যেতে পারে। **প্রথমত**, প্রচলিত নীতিবিদ্যা সমাজবদ্ধ মানুষের ঐচ্ছিক আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করে যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নীতিবিদ্যার সংজ্ঞায় রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের ঐচ্ছিক আচরণ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর আচরণ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় নয়। যেমন একজন মানুষকে যদি জোরপূর্বক কোন একটি কাজ করতে বাধ্য করা হয় তাহলে ঐ কাজের জন্য সে নৈতিকভাবে দায়ী নয়। কারণ কাজটি তার নিজের ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হয়নি। এমনকি মানুষ যে প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, বেড়ে ওঠে, অস্তিত্বশীল হয়, যে প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করে মানুষ জীবনধারণ করে সে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের আচরণ মূল্যায়ন প্রচলিত নীতিবিদ্যার আলোচনার বিষয়বস্তু নয় (দাস,২০০৩, ১৫০-১৬৮)। যেহেতু প্রচলিত নীতিবিদ্যা কেবলমাত্র সমাজবদ্ধ মানুষের ঐচ্ছিক আচরণকে মূল্যায়ন করে, তাই মানুষই কেবল নৈতিকভাবে বিবেচ্য, অন্যান্য প্রাণী নয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রাণীরা মানুষের মতো নিজের আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করতে সমর্থ নয়। তাই নৈতিকতার বিষয় তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রাচীন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক দার্শনিকই তাদের আলোচনায় মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও সক্রেটিস পূর্ববর্তী সময়ে দর্শনের আলোচ্য বিষয় ছিল জগত কেন্দ্রিক। কিন্তু সক্রেটিস পরবর্তী সময়ে দার্শনিকরা তাঁদের আলোচনায় মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করেন। তবে মানবকেন্দ্রিক আলোচনার উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটে সোফিস্টদের সময়ে। যদিও সক্রেটিসের দর্শনে মানব মর্যাদার বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। সোফিস্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাসের দর্শনেও মানুষের গুরুত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মতে, মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি (Stace, 1969, 112)। তাঁর এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে মানুষই হলো সবকিছুর নির্ধারক। অতএব মানুষের আচরণই কেবল নৈতিকভাবে বিবেচ্য, অন্যান্য প্রাণীর নয়।

তৃতীয়ত, মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, কেবল মানুষেরই স্বতঃমূল্য রয়েছে। মানুষ ব্যতীত পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য উপাদানের মূল্য মানুষই নির্ধারণ করে তাদের ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে। যেমনঃ একটি ভেড়া কখনোই নৈতিক দিক থেকে বিবেচ্য নয় এই অর্থে যে, ভেড়ার কোন স্বতঃমূল্য নেই। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নিজের প্রয়োজনে ভেড়াকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে বলেই তার ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। সারকথা হলো মানুষ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে তার উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে এমনকি নৈতিক কর্তা হিসেবে মানুষ বাস্তব প্রয়োজন

অনুসারে সেসবের মূল্যও নির্ধারণ করে। ক্যালিকটের মতে, মানবকেন্দ্রিক মূল্যতত্ত্ব সাধারণভাবে এ বিষয়ে একমত যে, কেবলমাত্র মানুষেরই স্বতঃমূল্য রয়েছে। মানুষ ব্যতীত সকল প্রকারের প্রাণী এবং অন্য সবকিছু কেবল যন্ত্রতুল্য মূল্যে মূল্যবান। অর্থাৎ মানুষের কাজে লাগার উপায় বা যন্ত্র হিসেবে এগুলোকে যতটুকু ব্যবহার করা যায় এগুলো ততটুকু পরিমাণে মূল্যবান (Callicot, 1984, 299)।

অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ

পরিবর্তনশীল বিশ্বের বিভিন্ন সংকট মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করে। অনেকের মতে মানুষের মনে প্রচলিত যে মনোভাব রয়েছে তা পরিবেশগত সংকট সূচনার কারণ হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে প্রকৃতির সকল উপাদানকে ব্যবহার করে আসছে। যদিও এসব উপাদান ব্যবহারের পক্ষে নৈতিক ন্যায্যতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে প্রযুক্তির সহযোগিতায় এক পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতিকে নির্বিচারে ব্যবহার করতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হতে শুরু করে যা বর্তমানে একটি উদ্বেগজনক অবস্থায় পৌছেছে। প্রকৃতির উপর মানুষের নির্বিচার ব্যবহার নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য কিনা সেই প্রশ্ন বর্তমান। অবশ্য অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের যারা বিরোধিতা করেন তাঁদের মতে, প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের মূল্য নির্ধারিত হয় মানব স্বার্থের আলোকে। মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুসারে তাদেরকে ব্যবহার করে বলে তাদের ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। কিন্তু অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করেন, প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানেরও মানুষের মতো স্বতঃমূল্য রয়েছে।

মানুষের ন্যায় প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের উপর নৈতিক মূল্য আরোপের ইতিহাস দীর্ঘদিনের নয়। ১৯৭০ সালে দর্শনের শাখা হিসেবে পরিবেশ দর্শনের সূচনা হয় মূলত প্রকৃতির উপর নৈতিক মূল্য আরোপের বিষয়কে কেন্দ্র করে। পূর্বে কেবলমাত্র মানুষকে নৈতিকভাবে বিবেচনা করা হতো। দর্শনের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, এরিস্টটল, ডেকার্ত, কান্ট এবং পাসমূর মানুষকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। যদিও পাসমূর একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করবে, নির্বিচারে নয়। প্রকৃতিকে নির্বিচারে ব্যবহারের যে মনোভাব মানুষের মনে রয়েছে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দাবি করে, মানুষের ন্যায় প্রকৃতির সকল উপাদানের নৈতিক মূল্য রয়েছে। মানুষ যেমন একে অপরকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না তেমনি প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকেও তাদের প্রয়োজন পূরণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিকাশে যাদের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে জেরমি বেন্থাম, আলবার্ট সোয়েটজার, লিওপল্ড, র‍্যাচেল লুইস কার্সন, আর্নে নায়েস, টম রিগ্যান এবং পিটার সিঙ্গার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জেরমি বেন্থাম ছিলেন একাধারে আইন ও সমাজ সংস্কারক। যদিও তিনি দার্শনিক হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। বেন্থাম প্রাণী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক। পাশ্চাত্য দার্শনিক এরিস্টটল, ডেকার্ত ও কান্ট বুদ্ধিবৃত্তিকে নৈতিক মূল্য আরোপের মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বেন্থাম ভিন্ন মত উপস্থাপন করেছেন। প্রাণী অধিকার নিয়ে তিনি তাঁর *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে বাস্তবে আমরা দেখি, মানুষ যেমন সুখ-দুঃখ অনুভব করে তেমনি প্রাণীরাও অনুভব করে। তাই বুদ্ধি নয় যা পাশ্চাত্যের কিছু দার্শনিক মনে করেন, বরং ভোগ করার সামর্থ্য হওয়া উচিত নৈতিক মূল্য আরোপের মানদণ্ড (Bentham, 2007, 22)। যেমন বাস্তবে আমরা দেখি কোন ক্ষুধার্ত প্রাণীকে খাবার দেয়া হলে সে উচ্ছ্বসিত হয়। এটি প্রমাণ করে যে, প্রাণীর আনন্দ ভোগের সামর্থ্য রয়েছে। আবার প্রাণীকে যখন আঘাত করা হয় তখন সে কষ্ট অনুভব করে। এভাবে দেখা যায় মানুষের মতো প্রাণীরাও সুখ-দুঃখ অনুভব করে। তাই এটি দাবি করা যায়, মানুষের ন্যায় প্রাণীদেরও নৈতিক মূল্য রয়েছে।

প্রাণী অধিকার নিয়ে যারা কাজ করেছেন এমনকি এখনো করেন তাদের মধ্যে আলবার্ট সোয়েটজার অন্যতম। সোয়েটজার তাঁর *The Ethics of Reverence for Life* রচনায় প্রাণী অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই সহজাত মূল্য রয়েছে। সকল প্রাণই পবিত্র ও কিছু মূল্যের অধিকারী (Schweitzer, 1987, 57)। সোয়েটজারের এ ব্যাখ্যা অন্য চিন্তাবিদদের ব্যাখ্যা থেকে পৃথক এই অর্থে যে, অন্য চিন্তাবিদরা নৈতিকতার যে আদর্শ প্রচার করেন তা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সূচিত। কিন্তু সোয়েটজারের দর্শন জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। এক্ষেত্রে তাঁর দর্শন উল্লেখযোগ্যভাবে কান্টের দর্শন থেকে পৃথক। তবে তাঁর দর্শনের সাথে ফ্রেডরিখ নিৎসে ও আর্থার শোপেনহাওয়ারের দর্শনের মিল রয়েছে। কেননা তাঁদের নীতিদর্শনও জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে রচিত। সোয়েটজারের মতে, যৌক্তিক প্রয়োজনে অন্য প্রাণকে ব্যবহার করার অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের জীবনকে মূল্যায়ন করার প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো প্রকৃতির অধীনস্থ সকল প্রাণকে নৈতিকভাবে বিবেচনা করা। তাঁর মতে, আমি অবশ্যই অন্য সকল জীবকে মূল্যায়ন করবো যেভাবে আমি নিজের জীবনকে মূল্যায়ন করি (Schweitzer, 1936, 230)।

অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে অনেকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিপরীত মতবাদ হিসেবে মনে করেন। তাঁদের মতে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হলো মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীদের

নৈতিক মর্যাদা সংশ্লিষ্ট একটি মতবাদ। প্রকৃত অর্থে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষসহ প্রকৃতির সকল উপাদানের নৈতিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করে। যেমন অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে মাটি, পানি, উদ্ভিদ ইত্যাদি সবকিছুই নৈতিক মূল্যের অধিকারী। যে যুক্তিতে মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা মনে করেন কেবল মানুষেরই নৈতিক মূল্য রয়েছে সেই একই যুক্তিতে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানেরও নৈতিক মূল্য রয়েছে। বাস্তবে অস্তিত্বশীল থাকার জন্য প্রকৃতির সকল উপাদান একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র্য মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে। তাই প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে মানুষের উচিত অন্য উপাদানকে নির্বিচারে ব্যবহার না করে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা। প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের নৈতিক মূল্য নেই দাবি করে যেসব যুক্তি উপস্থাপন করা হয় সেগুলোর খন্ডনপূর্বক তাদের উপর নৈতিক মূল্য আরোপের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

প্রথমত; পাশ্চাত্যের অন্যতম দার্শনিক এরিস্টটল মানব মর্যাদার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যদিও তাঁর যুক্তিগুলোর ন্যায্যতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এরিস্টটলের মতে, মানুষ একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে মানুষ নিজ ক্রিয়ার ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করতে পারে যা অন্যান্য প্রাণীরা পারে না। এরিস্টটলের মতে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে মানুষের উচ্চতর মর্যাদা রয়েছে। কারণ মানুষের ভাষা ব্যবহারের শক্তি রয়েছে। কিন্তু ভাষা শক্তির কারণে যদি মানুষ নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হয় তাহলে একই যুক্তিতে অন্য অনেক প্রাণীও নৈতিক মর্যাদার অধিকারী। কেননা বাস্তবে অনেক প্রাণীকে ভাষা ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে এখানে পিটার সিঙ্গারের বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থে প্রাণীরা যে ভাষা ব্যবহারে সক্ষম তা উল্লেখ করেছেন। অ্যালেন ও বেয়াট্রিচ নামক দুজন গবেষক প্রমাণ করেন যে, প্রাণীরা ভাষা ব্যবহার করতে পারে। তাঁরা ওয়াসু নামক একটি শিম্পাঞ্জিকে দীর্ঘদিন প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণের সময় তাঁরা শিম্পাঞ্জিটির সাথে এমনভাবে আচরণ করেন যেভাবে একটি মানবশিশুর সাথে আচরণ করা হয়। পরবর্তীতে শিম্পাঞ্জিটি কিছু প্রতীক ভাষা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিল। যখন ওয়াসুকে আয়নায় তার নিজস্ব প্রতিকৃতি দেখিয়ে জিজ্ঞাস করা হয় 'ঐটি কে?' সে উত্তর দিতে দ্বিধা না করে বলে, 'আমি, ওয়াসু' (Singer, 2011, 95)। অতএব এটি বলা যায়, ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্যের কারণে যদি মানুষের নৈতিক মূল্য থাকে তাহলে সেই একই অর্থে প্রাণীদেরও নৈতিক মূল্য রয়েছে।

এরিস্টটল যে বুদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন তা প্রাণীদেরও রয়েছে। বর্তমানে এমন অনেক প্রাণী রয়েছে যাদের বুদ্ধি প্রয়োগের সামর্থ্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পিটার সিঙ্গারের গ্রন্থে উপস্থাপিত ফিগান নামক শিম্পাঞ্জির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন

একদিন শিম্পাঞ্জির দলটিকে খাওয়ানোর কিছুক্ষণ পর ফিগান চোখে না পড়া একটি কলা লক্ষ করেছিল। কিন্তু গোয়িলাথ (ঐ দলেরই ফিগানের চেয়ে বয়সে বড় একটি পুরুষ শিম্পাঞ্জি) কলাটির সরাসরি নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিল। কলাটি থেকে গোয়িলাথের দিকে এক পলকেরও বেশি না তাকিয়ে ফিগান সেখান থেকে সরে যেয়ে তাবুর অপর পাশে বসলো যাতে সে আর কলাটি দেখতে না পায়। পনের মিনিট পর যখন গোয়িলাথ উঠে চলে গেল, ফিগান মুহূর্তমধ্যে দ্বিধা না করে সেখানে গিয়ে কলাটি সংগ্রহ করলো। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে সম্পূর্ণ অবস্থাটি অনুধাবন করতে পেরেছিল : যদি পূর্বেই কলাটি পাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করতো তবে গোয়িলাথ খুব সম্ভবত কলাটি ছিনিয়ে নিতো। যদি সে কলাটির কাছাকাছি অবস্থান করতো, তাহলে সে সম্ভবত মাঝে মাঝেই কলাটির দিকে তাকাতো। শিম্পাঞ্জিরা খুব দ্রুত লক্ষ করে এবং তাদের সঙ্গীদের চক্ষু সঞ্চালন বিশ্লেষণ করে, এবং এ কারণেই সম্ভবত গোয়িলাথ নিজেই ফলটি দেখে ফেলতে পারতো। সুতরাং, ফিগান মুহূর্তমধ্যে তার কামনা পরিপূরণ করা থেকে বিরতই থাকেনি, বরং সে দূরে চলে গিয়েছিল যাতে কলার দিকে তাকিয়ে সে গোপন কৌশল-পরিকল্পনার রহস্য ফাঁস না করে (রায়, ২০১২, ৮৪)। উদাহরণটি প্রমাণ করে যে, প্রাণীদেরও বুদ্ধি প্রয়োগের সামর্থ্য রয়েছে। শুধু তাই নয়, পিটার সিঙ্গার অপর একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে প্রাণীদের মানবশিশুর চেয়েও জটিল কাজ সম্পাদন করার সামর্থ্য রয়েছে। যেমন একটি পরীক্ষায় শিম্পাঞ্জিকে সারিবদ্ধ বস্তু থেকে মধ্যবর্তী বস্তুটিকে নির্বাচন করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। এমনকি বস্তুগুলোকে যখন সারিবদ্ধভাবে পর্যাপ্ত ব্যবধানে রাখা হয়নি তখনো শিম্পাঞ্জিটি সারিবদ্ধ ১১টি বস্তুর মধ্যে থেকে মধ্যবর্তী বস্তুটিকে ওঠাতে পেরেছিল (রায়, ২০১২, ৮৩)। এভাবে দেখা যায় বুদ্ধি প্রয়োগের সামর্থ্যের আলোকে প্রাণীদের নৈতিক মর্যাদা রয়েছে যে সামর্থ্যের আলোকে মানুষের উপর নৈতিক মর্যাদা আরোপ করা হয়। অতএব প্রাণীদের নৈতিক মর্যাদা অস্বীকার করার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন নৈতিক যুক্তি নেই। কেননা যে মানদণ্ডের আলোকে এরিস্টটল মানুষের নৈতিক মর্যাদার কথা বলেছেন সেই একই মানদণ্ডের আলোকে প্রাণীদেরও নৈতিক মর্যাদা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত; দার্শনিক জন পাসমূর মানবকেন্দ্রিকতার পক্ষে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন তা একটি জটিলতার সূচনা করে। তিনি মানুষকে নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। একইসাথে তিনি প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকে নির্বিচারে ব্যবহার না করে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করার কথা বলেছেন। কিন্তু এটি স্বীকৃত যে, প্রয়োজন শব্দটি আপেক্ষিক। যেমন একজন মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে যে অনুপাতে প্রকৃতির উপাদানকে ব্যবহার করে তাতে প্রকৃতির ভারসাম্য স্বাভাবিক থাকতে পারে। কিন্তু অপর একজন তার প্রয়োজন অনুসারে যদি প্রকৃতির উপাদান ব্যবহার করে তাহলে প্রকৃতির ভারসাম্য বড় মাত্রায় ব্যাহত হতে পারে। এখানে পাসমূরের দর্শন অনুসারে দ্বিতীয় ব্যক্তির

কাজও নৈতিকভাবে ন্যায্য। কেননা তিনি তার প্রয়োজন অনুসারেই প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। বস্তুত এমন যুক্তিতে প্রকৃতিকে ব্যবহার করার কোন নৈতিক ন্যায্যতা নেই।

তৃতীয়ত; আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের জনক রেনে ডেকার্ত মানুষের নৈতিক মর্যাদার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। মানুষের সাথে অন্য সবকিছুর পার্থক্য রচনা করার জন্য তিনি মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকে যন্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় যন্ত্রেরও বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে। অতএব যন্ত্র ও প্রাণী অভিন্ন এবং তাদের নৈতিক মর্যাদা নেই। কিন্তু মানুষের ন্যায় যন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গ থাকলেও মানুষ এবং যন্ত্র অভিন্ন নয় এই কারণে যে, যন্ত্র মানুষের মতো শব্দ তৈরি করতে পারে না। এমনকি যান্ত্রিক সহযোগিতায় শব্দ তৈরি করতে পারলেও তা পরিবর্তিত পরিবেশে মানুষের মতো আচরণ করতে পারে না। তাছাড়া যন্ত্রকে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিতে পারে না যা মানুষ পারে। যন্ত্রের সাথে মানুষের আরো একটি পার্থক্য হলো মানুষ নিজে নিজে ক্রিয়া করতে পারে যা যন্ত্র পারে না। একই যুক্তি অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাণীরাও যন্ত্রের মতো শব্দ করতে পারে না। যদিও কিছুকিছু প্রাণী প্রশিক্ষণের ফলে শব্দ তৈরি করতে পারলেও পরিবর্তিত পরিবেশে তা সম্ভব হয় না।

ডেকার্তের যুক্তিটি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রাণীরাও নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচিত হবে। কেননা বাস্তবে অনেক নাটক ও সিনেমায় দেখা যায় প্রাণীরা শব্দ তৈরি করে। অতএব শব্দ তৈরির সামর্থ্যের কারণে যদি মানুষ নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হয় তাহলে একই সামর্থ্যের কারণে অনেক প্রাণীও নৈতিক মর্যাদার অধিকারী হবে। এমনকি বর্তমানে অনেক প্রাণীকে ভাষা ব্যবহার করতেও দেখা যায়। তাই ভাষা ব্যবহারের কারণেও যদি মানুষ বিশেষ মূল্যের অধিকারী হয় তাহলে অনেক প্রাণীও বিশেষ মূল্যের অধিকারী হবে। ডেকার্ত আরো বলেছেন, প্রাণীদের মন নেই। মনের মধ্যেই বুদ্ধি অবস্থান করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, মানুষের ন্যায় প্রাণীদেরও মন রয়েছে। প্রাণীরাও মানুষের মতো সুখ-দুঃখ অনুভব করে যার উল্লেখ বেন্থামের দর্শনে রয়েছে। মানুষের যেমন জীবন রয়েছে তেমনি প্রাণীদেরও জীবন রয়েছে। মানুষের মতো প্রাণীরাও বুদ্ধিমান। প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজের জীবন কিভাবে সংরক্ষণ করতে হয় তা মানুষের মতো প্রাণীরাও জানে। মানুষ যেমন একে অপরের জন্য আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে তেমনি প্রাণীরাও প্রকাশ করে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষের চেয়ে শিম্পাঞ্জির যোগাযোগের সামর্থ্য বেশি। তারা পরিকল্পনা করে ভবিষ্যতের জন্য এবং পরস্পরের সাথে অনুভূতি ভাগাভাগি করে।

চতুর্থত; মানবকেন্দ্রিকতাবাদ দাবি করে যে, মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের মূল্য ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর নির্ভর করে যা আপেক্ষিক ও শর্তাধীন। অতএব মানুষই

কেবলমাত্র নৈতিকভাবে বিবেচ্য। যেমন একটি ছাগলের মূল্য একজন কৃষক ও একজন মাংস বিক্রেতার কাছে ভিন্ন। কারণ তারা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছাগলের মূল্য নির্ধারণ করে। অতএব ছাগলের কোন স্বতঃমূল্য নেই। যদি তাই হয় তাহলে মানুষেরও স্বতঃমূল্য নেই এই অর্থে যে, মানব কর্মের মূল্যও আপেক্ষিক। কারণ একই আচরণ কারো কাছে নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য আবার কারো কাছে নয়। প্রকৃতপক্ষে কোনকিছুর মূল্য আপেক্ষিক হওয়া তার স্বতঃমূল্যের অনুপস্থিতিকে বুঝায় না। তাছাড়া একই যুক্তিতে দাবি করা যায়, প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এক প্রাণীর কাছে অপর প্রাণীর মূল্য আপেক্ষিক। কেননা প্রাণীরাও প্রয়োজন অনুসারে একে অপরকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করে।

পঞ্চমত; মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পক্ষে পাশ্চাত্যের অনেক দার্শনিক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন যে, যারা ব্যক্তি তারাই কেবল নৈতিক মূল্যের অধিকারী। তাঁদের যুক্তি মূলত মানুষ-কেন্দ্রিক। তাঁদের মতে ব্যক্তি হওয়ার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োজন তা কেবল মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু যুক্তিটি যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা হয় তাহলে দেখা যায় অনেক প্রাণীও একই গুণের কারণে নৈতিক মর্যাদার অধিকারী। পিটার সিঙ্গার বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তাঁর *Practical Ethics* গ্রন্থে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, তাঁরা দাবি করেছেন যে ব্যক্তির কেবল নৈতিক মর্যাদা রয়েছে এই অর্থে যে, ব্যক্তি বুদ্ধির অধিকারী। এখানে তাঁরা ব্যক্তি প্রত্যয়টিকে কেবলমাত্র মানবশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানবশ্রেণির মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন নয়। যেমন পাগল, শিশু এমনকি অসুস্থ মানুষ। নৈতিক মর্যাদা আরোপের মানদণ্ড হিসেবে যদি বুদ্ধিকে বিবেচনা করা হয় তাহলে উল্লিখিত সত্তাগুলো নৈতিক মর্যাদার অধিকারী নয়। তাই তাদেরকে হত্যা কিংবা ব্যবহার করা অন্যায় নয়। কিন্তু পিটার সিঙ্গার ব্যক্তি প্রত্যয়টিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তার পরিধি ব্যাপক। কারণ তিনি প্রত্যয়টিকে মানব শ্রেণি ও অ-মানবশ্রেণি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। মানবশ্রেণির সদস্য যেমন ব্যক্তি হতে পারে তেমনি অ-মানবশ্রেণির সদস্যও ব্যক্তি হতে পারে। তাঁর মতে ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য কিছু নির্দিষ্ট গুণের অধিকারী অধিকারী হতে হয়। জোসেফ ফ্লেটশার এমন কিছু গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন আত্ম-সচেতনতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতের জ্ঞান, অতীতের জ্ঞান, অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা, অন্যের জন্য উদ্বিগ্নতা, ভাব বিনিময় ও কৌতূহল (Singer, 2011, 73)। উল্লিখিত গুণগুলো মানবসত্তায় থাকার সম্ভাবনা যেমন রয়েছে তেমনি অ-মানবসত্তায়ও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব যে যুক্তিতে মানুষ ব্যক্তি হিসেবে নৈতিক মূল্যের অধিকারী সেই একই যুক্তিতে অনেক প্রাণীও নৈতিক মূল্যের অধিকারী হতে পারে।

কিন্তু এটিও সত্য যে, উল্লিখিত গুণগুলো যেমন মানবশ্রেণির সকল সদস্যের মধ্যে নেই তেমনি অ-মানবশ্রেণির সকল সদস্যের মধ্যেও নেই। এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে যেমন মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলে অভিহিত করা যায় না তেমনি অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদও বলা যায় না। কারণ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অ-মানবসত্তার উপর নৈতিক মর্যাদা আরোপের বিপক্ষে। এমনকি মানবশ্রেণির সকল সদস্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে না এ মতেরও বিরোধিতা করে। অন্যদিকে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ প্রকৃতির সকল সত্তা নৈতিকভাবে বিবেচ্য নয় এই মতের বিরোধিতা করে। বস্তুত সিঙ্গারের দৃষ্টিভঙ্গি উভয় মতবাদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। এখানে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট তা হলো কিছু নির্দিষ্ট গুণ যদি প্রকৃতির উপাদানের উপর নৈতিক মর্যাদা আরোপের মানদণ্ড হয় তাহলে একদিকে যেমন উল্লিখিত মতবাদ দুটি ত্রুটিপূর্ণ হবে তেমনি অন্যদিকে প্রকৃতির কিছু উপাদানের উপর নির্বিচার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। নির্বিচার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে এই কারণে যে, প্রকৃতির অনেক উপাদানই সিঙ্গারের দর্শন অনুসারে ব্যক্তি নয়। অতএব মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই পিটার সিঙ্গারের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং প্রকৃতির সকল উপাদানকে নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচনা করে ন্যায্যতার ভিত্তিতে তাদেরকে ব্যবহার করাই কাম্য।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে সমন্বয়

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও বাস্তবে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। বিভিন্ন যুক্তিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের যে সীমারেখা তৈরি করা হয় তা কেবল দিকবিশিষ্ট। বাস্তবে দেখা যায়, সবল অর্থে মতবাদ দুটো বিপরীত প্রকৃতির। কিন্তু দুর্বল অর্থে নৈতিক মূল্যের আলোকে প্রথমটির প্রকৃতি দ্বিতীয়টির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মনে করে, পরিবেশের অন্তর্গত কোন উপাদান বিশেষ মূল্যের অধিকারী নয়। এমনকি নৈতিক মূল্যের আলোকে প্রকৃতির উপাদান হিসেবে মানুষও বিশেষ মূল্যের অধিকারী নয়। তাছাড়া মানুষের মধ্যে স্ব-জাতিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়ার যে প্রবণতা রয়েছে তা মতবাদটির ভিত্তিকে দুর্বল করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃতির বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কোন পারস্পরিক অনোন্যতা নেই। কিন্তু মানবকেন্দ্রিকতাবাদ শুধুমাত্র মানুষকে নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচনা করে এবং মনে করে একমাত্র মানুষেরই স্বঃতমূল্য রয়েছে। মানুষ ব্যতীত প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। অন্যদিকে অ-মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতা মানুষের বিশেষ মর্যাদাকে ব্যাহত করে। এভাবে দেখা যায় প্রথমটির বিকাশ দ্বিতীয়টির অস্তিত্বকে বিলীন করে এবং দ্বিতীয়টির বাস্তবায়ন প্রথমটির মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে। তাই একটি টেকসই বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মানুষের উচিত পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মানুষ পরিবেশের অন্যান্য

উপাদানকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মৌলিক চাহিদা নয় অর্থাৎ বিলাসী প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে অন্য প্রজাতিকে নির্বিচারে ব্যবহার করা নৈতিকভাবে অন্যায়। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এ ব্যাখ্যা দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ হিসেবে পরিচিত যা অগভীর বাস্তুতন্ত্রবাদের সমান্তরাল। ব্রায়ান জি. নর্টন তাঁর রচনায় দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদের গুরুত্ব উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ পরিবেশবাদীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় অবস্থান (Norton, 1984, 167)। কেননা দুর্বল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ মানুষের পাশাপাশি পরিবেশের অন্য সকল উপাদানকে নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচনা করে। এটি উল্লেখ্য যে, পরিবেশের অন্য যেকোন উপাদানের স্বার্থের চেয়ে মানুষের স্বার্থকে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নির্বিচারে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করবে। বস্তুত পরিবেশ ও মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানই কেবল দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে অ-মানব সত্তার প্রতি আমাদের যত্নশীল আচরণই বুদ্ধিদীপ্ত মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দিশা হতে পারে।

উপসংহার

উল্লিখিত বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, সবল অর্থে মতবাদ দুটোর প্রকৃতি বিপরীতধর্মী। প্রথমটি অ-মানবসত্তার নৈতিক মূল্যকে অস্বীকার করে এবং দ্বিতীয়টি মানুষের মর্যাদাকে ব্যাহত করে। কিন্তু দুর্বল অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ সমর্থনযোগ্য এ কারণে যে, এটি পরিবেশের অন্তর্গত সকল উপাদানকে নৈতিক মূল্যের আলোকে বিবেচনা করে। মানুষ যদি সত্যিকার অর্থে মানবকেন্দ্রিক হয় তাহলে তারা মানব-প্রকৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে এবং একইসাথে অ-মানব সত্তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে। কেননা আমরা একটি কুকুরকে তার কুকুর-কেন্দ্রিকতার জন্য অন্যায্যভাবে বিবেচনা করতে পারি না। তাছাড়া অন্য প্রজাতির প্রতি নির্দয় হওয়ার প্রবণতা একপর্যায়ে স্বজাতিকেও প্রভাবিত করে। তাই মানুষের উচিত অনুধাবণ করা যে, প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সাথে তারা একই ভূ-পৃষ্ঠে অস্তিত্বশীল। পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের প্রতি মানুষের নির্বিচার আচরণ পুরো পরিবেশের জন্য ধ্বংস বয়ে আনে যা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাছাড়া প্রকৃতির ক্ষতি পরোক্ষভাবে মানুষের স্বার্থকেই ব্যাহত করে। একইসাথে এটিও স্বীকার্য যে, প্রকৃতির সকল উপাদানকে অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব। অতএব মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে ন্যায্যতার ভিত্তিতে প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানকে ব্যবহার করবে। কেননা পরিবেশের অন্তর্গত সকল উপাদানের মধ্যে কেবল মানুষই বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। তাই স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত। পাশাপাশি মানুষের উচিত পরিবেশের অন্যান্য উপাদানকে নিজেদের স্বার্থে সংরক্ষণ করা।

টীকা

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ Anthropocentrism যা গ্রিক শব্দ ‘Anthropos’ ও ‘Kentron’ থেকে উদ্ভূত। Anthropos শব্দের অর্থ হলো মানুষ এবং Kentron শব্দের অর্থ হলো কেন্দ্রিক। অতএব বুৎপত্তিগত অর্থে মানবকেন্দ্রিক প্রত্যয়টির অর্থ হলো মানুষ-কেন্দ্রিক। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বস্তুত মানুষ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে। এ সম্পর্কে দেখুন, জসীম উদ্দিন ও কালী প্রসন্ন দাস, পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও স্বতঃমূল্য: একটি বিভ্রান্তি নিরসন, *দর্শন ও প্রগতি*,(২০০৬), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র।

গ্রন্থপঞ্জি

Bentham, Jereemy. (2007). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Dover Publication: New York.

Botzler, R.G. and Armstrong, S.M. (2003). *Environmental Ethics: Divergence and Convergence*. MacGraw Hill Co. Inc.: USA.

Callicot, J.B. (1985). Intrinsic Value, Quantam Theory and Environmental Ethics. *Environmental Ethics*. Centre for Environmental Philosophy: Texas.

Ferre, Fredrich. (1994). Personalistic Organism: Paradox or Paradigm?. *Philosophy and the Natural Environmant*. Cambridge University Press: Cambridge.

Hargrove, Eugene C. (1992). Weak Anthropocentric Intrinsic Value. *The Monist*. Oxford University Press: Oxford.

Johnson, Lawrence E. (1991). *A Morally Deep World*. Cambridge University Press: Cambridge.

Kant, I. (1785). *Fundamental Principles of the The Metaphysics of Morals* (Translated by Thomas Kingsmill Abbott in 1949). Pearson: London.

Leahy, Michael P.T. (1993). *Against Liberation: Putting Animals in Perespective*. Routledge: New York.

Mitra, Madhabendra Nath. (2003). Reflections on Environmental Ethics. *Rogunath Ghosh’s Truth and Value*.New Bharatiya Book Corporation: Delhi.

Norton, Bryan G. (1984). Environmental Ethics and Weak Anthropocentrism. *Environmental Ethics*. Centre for Environmental Philosophy: Texas.

Passmore, John. (1980). *Man’s Responsibility for Nature*. Duckworth: London.

Schweitzer, Albert. (1936). *The Ethics of Reverence for Life*. Syracuse University Press: New York.

Schweitzer, Albert. (1987). *The Philosophy of Civilization*. Prometheus Book: Buffalo.

Singer, Peter. (2011). *Practical Ethics*. Cambridge University Press: Cambridge.

Stace, W.T. (1969). *A Critical History of Greek Philosophy*. Macmillan Press: London.

Zondervan. (1984). *The Holy Bible* (New International Version). Zondervan Publishing House: Michigan.

উদ্দিন, জসীম। (২০০৭)। মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধান। *দর্শন ও প্রগতি*। গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উদ্দিন, জসীম ও দাস, কালী প্রসন্ন। (২০০৬)। পরিবেশ নীতিবিদ্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ও স্বতঃমূল্যঃ একটি বিভ্রান্তি নিরসন। *দর্শন ও প্রগতি*। গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্রঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দাস, কালী প্রসন্ন। (২০০৩)। পরিবেশ নীতিবিদ্যাঃ উদ্ভব ও বিকাশ (হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, *কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন*)। মফিজউদ্দিন আহমদ স্মৃতিসংসদঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সিঙ্গার, পিটার। (২০১২)। *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* (অনুবাদ, প্রদীপ কুমার রায়)। অবসর প্রকাশঃ ঢাকা।